কাব্যগ্রন্থ

এসেছি দেব পিকনিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

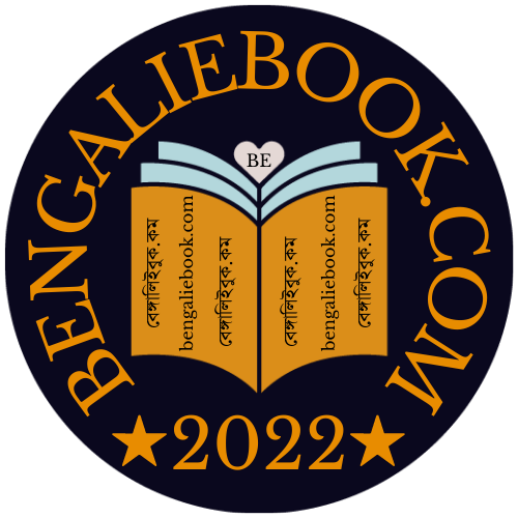

সূচিপত্র

অবেলায় প্রেম 4
আত্মদর্শন 4
আমাকে জড়িয়ে 6
এ কার উদ্যান? 6
এই জীবন 7
এই দৃশ্য 8
এই সময় 9
এক জীবন 10
একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল... 10
এখন আমি 11
এখানে কেউ নেই 12
কথা ছিল 13
কালো অক্ষরে 13
কে তুমি 14
কেঁদুলির যাত্রী 15

কেউ শুধালো না..... ১৬
খেলাচ্ছলে..... ১৬
খেয়াঘাটে ১৭
চায়ের দোকানে ১৮
জলের কিনারে ১৯
তুমি আমি..... ১৯
দেখা..... ২০
দেখা হবে ২১
দেখিনি বহু দিন ২২
ধলভূমগড়ে আবার..... ২৩
নীরার কাছে..... ২৪
প্রতিহিংসা..... ২৫
প্রত্যাখ্যান..... ২৬
প্রাণের প্রহরী ২৭
ফুল..... ৪১
ফেরা না ফেরা..... ৪২
বকুল গাছের নীচে ৪৩
বাসের ভিতরে..... ৪৪

ভালোবাসা 45
মানুষ যতটা বড় 45
মানুষের মুখ চিনে 46
মায়া সুন্দর 47
মুখ দেখিনি 48
রূপনারানের কূলে 48
রেলের কামরায় পিপড়ে 49
লাইব্রেরীর মধ্যে 50
শব্দ আমার 51
শিল্প প্রদর্শনীতে 51
সুধা, মনে আছে? 52

অবেলায় প্রেম

তুমি কি বিশ্বাস ভুলবে, বলবে এসে, প্রথম তরুণ
আমাকে মৃত্যুর থেকে তুলে নাও, মুহূর্তে বাঁচাও চোখ তুলে
অথবা মুহূর্ত যেন জন্মান্তর পায়, যেন পাপহীন ভুলে
সুকুমার স্তন ওষ্ঠ জঙ্ঘা ল, ভবিষ্যৎ ভ্রূণ
অচিরাৎ সৌন্দর্যের এ পান্থনিবাসগুলি বেঁচে বর্তে থাকে!
বিবিধ অপ্রেম এসে না হয়তো শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাবে।
তুমি কি ঝড়ের মধ্যে ছুয়ে যাবে সর্বস্ব শিকড়হীন সন্ধ্যায় আমাকে
বিশ্বাস ভাঙার শব্দ সঙ্গীতের মতন শোনাবে?

কেন না বাঁচানো যায় না, রূপ রস গন্ধে প্রতিশোধ
স্পন্দনে ঢোকায় বিষ, বহু সাময়িক মৃত্যু ফলভোগ করে
তোমাকে সময় থেকে তুলে নেবো, শৈশবের এই প্রিয় বোধ
পশ্চিমে চলেছে, দেখ, পশ্চিম কী রমণীয়, অন্ধকার ঘরে
এখন পিশাচ সিদ্ধ অগ্নি জ্বলে, কাপুরুষ লোভে জাগে স্নায়ু
এখন প্রার্থনা নেই, অপমৃত্যু আমাদের কেড়ে নেবে আয়ু।

আত্মদর্শন

অস্ত্র বানিয়েছিলুম পশুর বিরুদ্ধে, আজ পশুরা নিঃশেষিতপ্রায়
যে ক'টি রয়েছে, তাদের আদর যত্নে রেখেছি সাজানো বাগানে
এদিকে জমে গেছে অস্ত্রের পাহাড়
দিবাবসানের রক্ত আলোয় দেখা যায় মানুষের স্রোত

চতুর্দশী চাঁদের দিকে রোমহর্ষক ব্যস্ততা
যন্ত্র কষে দেয় ন্যায় অন্যায়ের হিসেব
কুকুরে চাটে পরমান্নের থালা, বিনা বাধায় ছুঁয়ে দেয় যজ্ঞ-পুরোভাস।

বীজাণুর চেয়েও দ্রুতবেগে বেড়ে-ওঠা মানুষ এগিয়ে আসে
নিজের মুখচ্ছবিকেই সে ভয় পায়
ভাদ্রমাসের ব্যাঙ আশ্রয় নেয় মানুষের গলায়
জলে-রোদুরে স্নান করে মাঠে হাল ধরে আছে পাঁচ হাজার বছরের
পুরোনো মানুষ
আর নগরে বন্দরে নতুন মানুষেরা ছুঁয়ে আছে অস্ত্রের বোতাম
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়
কেউ নদীর জলে একলা চোখের জল মেশায়
রঙ্গালয়ে কোমর-লোভী যুবকের হাত অনায়াসে যা চায় তা পায়
সে জানে না সে সাতাশটি মৃত্যুর জন্য দায়ী
পাপবোধ নিয়ে লেখা হয় কাব্য আর নিরপরাধ কারাগারে বসে
খোঁটাখুঁটি করে চাম পোকা
রাস্তায় ছোটাছুটি করে অনিচ্ছার ফসলের মতন শিশু
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়
অথচ ভালোবাসার কথা ছিল, অথচ মানুষ মানুষের কাছাকাছি
আসার কথা ছিল
ভূলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নায় মিশে আছে বহু শতাব্দীর মনীষা
চতুর্দিকে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার সংঘর্ষ
চতুর্দিকে ভেঙে যাবার অসম্ভব শব্দ, ঠিক যেন ওঙ্কারের মতন
কেউ শোনে না...

আমাকে জড়িয়ে

হে মৃত্যুর মায়াময় দেশ, হে তৃতীয় যামের অদৃশ্য আলো
তোমাদের অসম্পূর্ণতা দেখে, স্মৃতির কুয়াশা দেখে আমার মন কেমন করে
সারা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম কারুণিক নিষাদ
তার চোখ মেটে সিঁদুরের মতো লাল, আমি জানি তার দুঃখ
হে কুমারীর বিশ্বাসহন্তা, হে শহরতলীর ট্রেনের প্রতারক
তোমাদের টুকিটাকি সার্থকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরোনো মাছের আঁশ
হে উত্তরের জানালার ঝিল্লি, হে মধ্য সাগরের অবিযাত্রী মেঘদল
হে যুদ্ধের ভাষ্যকার, হে বিবাগী, হে মধ্যরয়সের স্বপ্ন, হে জন্ম
এত অসময় নিয়ে, এমন তৃষ্ণার্ত হাসি, এমন করুণা নিয়ে
কেন আমাকে জড়িয়ে রইলে,
কেন আমাকে.....

এ কার উদ্যান?

এ কার উদ্যান? কে এত সযত্নে সাজিয়েছে
ফুলের কেয়ারি
সবুজ ঘাসের পাশে গোলাপ দুর্দান্ত লাল,
এবং মাধবী
কিশোরী মেয়ের মতো সদ্য যৌবনের দিকে
হাত বাড়িয়েছে।
শিউলি ফুলের রাশি ঝরে আছে শৈশবের স্মৃতি
বিভিন্ন সুগন্ধ যেন ঝড় হয়ে ছুটে আসে ঘ্রাণে–

এ কার উদ্যান?
এই পটুলেকা, এই যূথী সমারোহ?

এ আমারই।
রেলিং-এর পাশে আমি দীন ভিখারীর মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছি।
আমার এ পৃথিবীতে এক টুকরো ভূমিখণ্ড নেই।
তবু এই কুসুমের এমন উৎসব সাজ,
সৌরভের এই বন্যা–
সকলই আমার
ক্ষুধার্তের মতো আমি এই রূপ শুষে নিই চুষে চুষে খাই!

এই জীবন

ফ্রয়েড ও মার্ক্স নামে দুই দাড়িওয়ালা
বলে গেল, মানুষেরও রয়েছে সীমানা
এঁচোড়ে পাকার মত এর পর অনেকেই চড়িয়েছে গলা
নৃমুন্ড শিকারী দেয় মনোলোকে হানা।

সকলেই সব জানে, এত জ্ঞানপাপী
বলেছে মুক্তর রং শাদা নয় খাকি
তবু যারা সিংহাসন নেয় তারা কথার খেলাপি
আবং আমার ভাই, মা-বোন নিখাকী।

ছিঁড়েছে সম্রাজ্য ঢের, নতুন বসতি
পুরোনো হবার আগে দু'বার উল্টায়
দিকে দিকে গণভোটে রটে যায় বেশ্যারাও সতী

রং পলেস্তারা পড়ে দেয়ালের চলটায়।

এরকম চলে আসে, তবু নিরালায়
ছোট এক কবি বলে যাবে সিধে কথা
সূর্যাস্তের অগ্নিপ্রভা লেগে আছে আকাশের গায়
জীবনই জীবন্ত হোক, তুচ্ছ অমরতা।

এই দৃশ্য

হাঁটুর ওপরে থতনি, তুমি বসে আছো
নীল ডুরে শাড়ী, স্বপ্নে পিঠের ওপরে চুল খোলা
বাতাসে অসংখ্য প্রজাপতি কিংবা সবই অভ্রফুল?
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
চোখ দুটি বিখ্যাত সুদূর, পায়ের আঙুলে লাল আভা।
ডান হতে, তর্জনিতে সামান্য কালির দাগ
একটু আগেই লিখছিলে
বাতাসে সুগন্ধ, কোথা যেন শুরু হলো সন্ধ্যারতি
অন্যদেশ থেকে আসে রাত্রি, আজ কিছু দেরি হবে
হাঁটুর ওপরে থুথনি, তুমি বসে আছো
শিল্পের শিরায় আসে উত্তেজনা, শিল্পের দু'চোখে
পোড়ে বাজি
মোহময় মিথ্যেগুলি চঞ্চল দৃষ্টির মতো, জোনাকির মতো উড়ে যায়
কোনোদিন দুঃখ ছিল, সেই কথা মনেও পড়ে না
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
সময় থামে না জানি, একদিন তুমি আমি সময়ে জড়াবো
সময় থামে না, একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে

দিগন্ত পেরিয়ে-
নতুন মানুষ এসে গড়ে দেবে নতুন সমাজ
নতুন বাতাস এসে মুছে দেবে পুরোনো নি:শ্বাস,
তবু আজ
হাঁটুর ওপরে থুতনি,তুমি বসে আছো
এই বসে থাকা, এই পেঠের ওপরে খোলা চুল,
আঙুলে কালির দাগ
এই দৃশ্য চিরকাল, এর সঙ্গে অমরতা সখ্য করে নেবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো..,.

এই সময়

দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হয়ে
থাকতে চাইনি
সকলি গোপন, সকলি নীরব, একা একা শুধু
বুক ভার করা
কার কাছে যাবো, কাকে যে বলবো, কেউ নেই, কোনো
নাম মনে নেই
সকলে আলাদা, নিরালায় একা, কেউ কারো মুখে।
সহজে চায় না
কোনো কথা নেই, শুধুই শুকনো লৌকিকতার
লঘু চোখাচোখি
জীবন চলেছে জীবনের মতো, তার নিচে চাপা
হালকা বিপদ
বিপদের আরও অনেক গভীরে ইট চাপা আছে

ধিকি ধিকি রাগ
দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হতে
চাইনি জীবনে।

এক জীবন

শামুকের মতো আমি ঘরবাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি
এই দুনিয়ায় আমি পেয়ে গেছি অনন্ত আশ্রয়
এই রৌদ্র বৃষ্টি, এই শতদল বৃক্ষের সংসার
অস্থায়ী উনুন, খুদ কুঁড়ো–
আবার বাতাসে ওড়ে ছাই
আমি চলে যাই দূরে, আমি তো যাবোই,
জন্ম মৃত্যু ছাড়া আর আমি কোনো সীমানা মেনেছি?

এ আকাশ আমারই নিজস্ব
আমারই ইচ্ছেয় হয় তুঁতে
নারী ও নদীরা সব আমারই নিলয়ে এসে
পা ছড়িয়ে স্মৃতিকথা বলে
চমৎকার গোপন আরামে কাটে দিন
আর সব রাত্রিগুলি নিশীথ কুসুম হয়ে ঝরে যায়...

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল...

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এর এক নৈঃশব্দকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,

এ জীবনে দেখাই হলো না।
জীবন রইলো পড়ে বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ভেজা ভূমি
তার কিছু দূরে নদী-
জল নিতে এসে কোনো সলাজ কুমারী
দেখে এক গলা-মোচড়ানো মারা হাঁস।
চোখের বিস্ময় থেকে আঙুলের প্রতিটি ডগায় তার দুঃখ
সে সসয় অকস্মাৎ ডঙ্কা বাজিয়ে জাগে জ্যোৎস্নার উৎসব
কেন, তার কোনো মানে নেই
যেমন বৃষ্টির দিনে অরণ্য শখরে ওঠে
সুপুরুষ আকাশের সপ্তরং ভুরু
আর তার খুব কাছে মধুলোভী আচমকা নিশ্বাসে পায়
বাঘের দুর্গন্ধ!
একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল
আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না!

এখন আমি

হাতের মুঠোয় ছিলএকটা মস্তবড় নদী
নদীর মধ্যে ছিল আমার বাল্যকালের ভয়
ভয়ের পাশে সরলতার বাগান আর প্রাসাদ
হারিয়ে গেল,
সমস্তই হারিয়ে গেল!
নদীও নেই, ভয়ও নেই, কোথায় সেই

কাননঘেরা বাড়ি?
এখন আমি মানুষ, আমি কঠিন একটি মানুষ!

এখানে কেউ নেই

এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
টগর চেয়ে আছে, শুকনো পাতা ওড়ে
ভ্রমর ফিরে আসে,
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্যান্ট খোললা, এখানে শার্ট খোললা,
জাঙ্গিয়া গেঞ্জিও
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে রোদ আছে, বাতাস দেহ কাটে,
গন্ধে শিহরন
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্রেম হবে, দারুণ খেলা হবে,
শরীর চমকায়
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
মাটিতে গড়াগড়ি, কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া
নিবিড় রণ হলো

এমন রতি সুখ, এমন ভালোবাসা,
জীবনে একবার!

কথা ছিল

এই দুরন্ত রাতের খেলা, কথা ছিল
বনের মধ্যে রেশম, এত লাল রেশম, কথা ছিল?
বাতাস ভাঙে বিজন দ্বীপ, আকাশ ভাঙে ঘর
দুঃখ ভাঙে নরম হাত, কঠিন হাত, কথা ছিল।
হে সুন্দর, হে আনন্দ, এত সুদূর?
ফেরার পথ ভুলে যাবার কথা ছিল।

কালো অক্ষরে

কালো অক্ষরে থেকেছি মগ্ন সারাদিন সারা মাস ও
বছর
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, জুলপি ও চুলে
সাদা সাদা ছোপ
বাইরে আকাশ, বাইরে মধুর, বাইরে নারীরা
এই যে আয়ুর হনন এই যে দিন দিনান্ত হৃদয়ে প্রবাস
এই যে পরের দুঃখ ও সুখ, যে যার খেলায়
রয়েছে মত্ত
কার নিশ্বাস কার চাপা হাসি চকিতে তাকাই
সকলই অলীক

শুধু কাছে থেকে কালো অক্ষর, সারাদিন সারা মাস ও
বছর
কালো অক্ষর কালো শৃঙ্খলা এক জীবনের ভ্রান্তি বিলাস
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, আয়ুর হনন,
হৃদয়ে প্রবাস।

কে তুমি

–কে তুমি? আড়াল থেকে সামনে এসো।
–কোথায় আড়াল? এ প্রকাশ্য দিবালোকে
সামনে এসেছি।
–তবুও চোখের সামনে যেন একটা মসলিনের পর্দা,
রৌদ্রে আরও ধাঁধা লাগে,
কে তুমি? কে তুমি?
–দ্যাখো, আরো একটু সামনে এসেছি,
এখনো চিনলে না?
–খানিকটা চেনা, চেনা এখনো অস্পষ্ট মুখ
ঐ হাসি কোথায় দেখেছি?
ঐ চিবুকের রেখা, ঐ চোখ কার?
–তুমি বহুদূর চলে গিয়েছিলে
আমার কথা কি আর মনেও পড়েনি?
–জীবন জটিল এত, কত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছি
কী করে সকলকে মনে রাখি?
–এক সময় ভালোবাসা ছিল, কথা ছিল
আজন্ম দুজনে দেখা হবে

সব ভুলে গেলে?
--কে তুমি, হেঁয়ালি ছেড়ে পরিচয় দাও।
—আমিই হেঁয়ালি তোমার জীবন সঙ্গী, কৈশোরের স্বপ্ন
মনে নেই?
আমাকে পেছনে ফেলে তুমি কোন্ কর্কশ জগতে
চলে গেলে?

কেঁদুলির যাত্রী

সেই অন্ধকার পথ ভেঙে যাওয়া, অজস্র জোনাকি, বুকের
উষ্ণতা কাড়ে হাওয়া, তবু শ্রবণ উৎকর্ণ, আরো দূরে, অথচ
তেমন দূরে নয়, আঁধার নিমার্ণ থেকে উঠে আসে অঙ্গহীন
রথ, অদেখা নদীর কাছে খেলা করে স্বর্গের সৌরভ...
পায়ে পায়ে যাওয়া, শুধু যাওয়া, খুব বেশি দূরে নয়, অথচ
পথের শেষ বাঁকে, ভাষাহীন বন্ধুদল, চকিতে ঝিলিক দেয়
নিজস্ব আগুন, ক্রমশই গাঢ় হয়ে আসে শীত, র‍্যাপার লুটিয়ে
পড়ে গৈরিক ধুলোয়, অকস্মাৎ জেগে ওঠে পাখির কান্নার মতো
গান...
এখানে ওখানে আলো, কালো ছায়া, অসংখ্য অদৃশ্য হাত
হাতছানি দিয়ে ওঠে, এবার বাতাস কেটে ছুটোছুটি, দোকানে
বিনিদ্র মাছি এবং চিনির গন্ধ পাশে রেখে চলে যাই, ভিজে
ঘাসে ধুপ করে বসে পড়ি, বালক বাউল রাখে আকাশের
দিকে চোখ, সুর যায় দিগন্ত পেরিয়ে।

কেউ শুধালো না

মাথায় একটা ডাণ্ডা, একটা বুনো শব্দ, শেষ!
লোকটা মরে পড়ে রইলো,
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে!

লোকটা কোনো শিশুর গালে
দেয়নি বুঝি টোকা?
ঘোমটা-পরা নারীর হাত মুঠোয় ধরে
পার হয়নি মাঠের রেল লাইন?
ঘাম-জড়ানো বুকের মধ্যে ছোয়নি কোনো কান্না?
এই লোকটি মাটিকে ভালোবাসেনি?
এই লোকটি ধানের গন্ধ নেয়নি?
এই লোকটি শীতের রাতে নিজের গায়ের কাঁথা
দেয়নি অন্যকে?
এসব কেউ শুধালো না
যাবার পথে একবারও কেউ ফিরেও তাকালো না
লোকটা মরে পড়ে রইলো
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে।

খেলাচ্ছলে

‘ফেরা’ এই শব্দটিকে ভিজে নিয়ে চোষাচুষি করি
খেলাচ্ছলে

এবং একার খেলা কোনোদিন নিয়ম মানে না
ছাদের পাঁচিল ছেড়ে লাফ দেয় তেজী বল
উড়ে যায় ব্রীজের ওপারে
বাতাস আঁচড়ায় শীত, সন্ধ্যা আনে কালো আলোয়ান
জিভ ক্ষার হয়ে আসে, শব্দটি সশব্দ হয়ে
ভয় পাওয়ায়
এতক্ষণ একা ঠায় দাঁড়িয়ে কিসের জন্য 'ফেরা' ?
একি ফিরে আসা, নাকি ফিরে যাওয়া, কার?
কে জানে ফেরার মর্ম, অলৌকিক এ শব্দটি কাকে
কী শেখায়!

আমি কি পৃথিবী কিছু ভারী করে আছি?
হে মানুষ, হে মানুষী, এবার আমার দিকে।
রুমাল ওড়াবে?

খেয়াঘাটে

ডোরাকাটা সসায়েটারের মতো চামড়া
একটি কুকুর ছুটে গেল
কোনাকুনি পশ্চিমের দিকে
তখন বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্ত
তীব্র নাদে কাঁপিয়ে ভল্লুক বর্ণ মেঘ
একটি রুপালি কশা
সোজা এসে গেথে গেল
নদীর পাঁজরে

পিত্তল বাসন নিয়ে সিক্ত এক নারী
চলে গেল শাড়ী সপসপিয়ে
ঈষৎ পৃথুলা, তবু কোমরে জাদুর ছোঁয়া
বাঁক ঘুরবার আগে তাকে ছুঁয়ে ছেনে গেল
চৈত্রের বাতাস
তিনটি ধবল হাঁস সেধে নিল গলা...

খেয়াঘাটে এসময় আর কেউ নেই, আমি একা–
আমি কি যাবো না? আমি পিছনে দৌড়োব?
যতই চিৎকার করি, বজ্রপাত ছাড়া কোনো
প্রত্যুত্তর নেই।
কালো হয়ে আসে বেলা, আমি সুচ রাজা হয়ে
ভূমিতে শয়ান।

চায়ের দোকানে

এইটুকুনি শহর তার দু'দিকে ট্রেন লাইন
মাথার ওপর আকাশ আর যেদিকে যাও আকাশ
নক্সা কাটা রেল কলোনি, খানিক দূরে বাজার
তার ভিতরে চায়ের দোকান, তার ভিতরে
কবির দলের টেবিল।

উনিশ থেকে তেইশ কিংবা খানিক এদিক-ওদিক
সেদিন যারা কিশোর ছিল এখন সদ্য যুবক
বোতাম খোলা শার্টের নীচে হাতে-গরম হৃদয়
ওষ্ঠে গালে নতুন নোম, যখন তখন

চিরকালের হাসি।

তিনটি চা, সাতটি কাপে, দুই সিগারেট ছ' জন
কথায় কথায় তুফান ওঠে, রৌদ্র-ঘড়ি স্থির
রুক্ষ চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, কণ্ঠভরা দাপট
এই টেবিলটি এক দুনিয়া, এই টেবিলে
অন্যরকম জীবন।

এইটুকুনি শহর, সেটা যখন তখন ফুরোয়
চেনা মানুষ, ভেজাল কথা, জন্ম-মৃত্যু-মিলন
সব কিছুই তো মাপ মতন, রৌদ্র বৃষ্টি-শীতও
শুধু চায়ের দোকানটিতে কয়েকজন
ছদ্মবেশী রাখাল!

জলের কিনারে

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
যেখানে তৃষ্ণার কোনো শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ঐ পথে যেতে চায়?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলেরই নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে?

তুমি আমি

গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে থাকে
তুমি আমি জমি কিনি, রবিবারে রুই মাছের মুড়ো
এসব দোষের নয়, আত্মসুখ কে না চায়, বলো?
যেখানেই যাও তুমি, গরীব ও ভিখিরির বড় আবর্জনা
তুমি আমি চলে যাই সমুদ্রে বা পাহাড়ে হুল্লোড়ে
গরীব কোথায় নেই, গরীবেরা বীজাণুর মতো
মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়, মনে হয় কিছু করা যাক
তুমি আমি সভা করি, সমবেত মিছিলে গর্জাই
বিমানেরর পেটে ঢুকে রাজধানী যাওয়া-আসা করি।
গরীবের জীবনের দাম আছে, এ রকম সার সত্য বলে
নিজের জীবন বীমা মাসে মাসে সুরক্ষিত থাকে।
গরীবের কথা ভেবে মনে পড়ে তোমার আমার
চেয়ে আরও কত বেশি ধনীরা রয়েছে কেন, কেন?
আরও গায়ে জ্বালা ধরে গরীবের জন্য দুঃখ বাড়ে
গরীবের নাম নিয়ে মদের টেবিলে ওঠে ঝড়।
গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে মরে
যেমন আপন মনে বহুকাল এমনই মরেছে
তুমি আমি কষ্ট পাই, কবিতার খুব রেগে উঠি।

দেখা

-ভালা আছো?
-দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে?
-ভালো আছো?
-দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো ঝড়?

-ভালো আছো?
-এই মাত্র চমকে উঠলো ধবধবে বিদ্যুৎ।
-ভালো আছো?
-তুমি প্রকৃতিকে দেখো
-তুমি প্রকৃতিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো
-আমি তো অণূর অনু, সামান্যের চেয়েও সামান্য
-তুমিই তো জ্বালো অগ্নি, তোলো ঝড়, রক্তে এত উম্মাদনা
-দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়
-তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি, তুমি ভালো আছো?

দেখা হবে

দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায়
অথবা যদি না পারি
দেখা হবে নদীতীরে বালার্ক উষায়
কামানের ঘোর শব্দ যখন জোয়ার-স্রোত ভাঙে
অথবা যদি না যেতে পারি
দেখা হবে স্কুল-পথে যেমন শৈশবে
বারবার দেখা হয়ে যেত
একটি চাহনি কিংবা দু পলক হাসির ঝিলিক
দেখা হবে অশ্লেষায়, পরাজিত ঘোর অবেলায়
দেখা হবে শৃঙ্খলিত দিনে কিংবা নিকষ রাত্রিতে
অথবা যদি না যেতে পারি
যদি সব পথ জুড়ে খাড়া থাকে উল্লুকের পাল
প্রলয়ের শেষে দেখা হবে।

দেখিনি বহু দিন

ছেঁড়া জামা, রুক্ষ চুল, জুতোয় পেরেক–
সে ছেলেটা কোথায় যে গেল!
পকেটে চকমকি ভরা, দুপুরে বা মধ্যরাত্রে মেধার ভ্রমণ
পায়ের তলায় সর্ষে, সর্বক্ষণ খিদে–
চতুর্দিকে সার্থকতা উদ্যানের বাথরুম হয়েছে
বস্তি ভেঙে গড়া হলো অন্তিম যাত্রার কত রাস্তা
অফিস ফেরার পথে অনেকেই সেইখানে
নিজের জুতোর শব্দে মুগ্ধ হয়ে গেছে–
এরকম সুন্দরের মধ্যে সেই অভুক্ত যৌবন
দুহাত ছড়িয়ে তবু ঘোষণা করেছে,
আমি আছি।
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন!

সে বড় লাজুক, খুব অভীষ্ট বাড়িতে গিয়ে
বলেনি একটিও ছোট কথা
সিঁড়ির উপরে স্থির সাদা ফ্রক পরা রাজহংসীটিকে দেখে
কেঁপেছিল তার বুক বহুবার কেঁপেছিল বুক
তবু মুখ, তবু মুখ, তবু মুখ বন্ধ ছিল
সব কথা আগুনের ফুলকি হয়ে সহস্র চিঠির সঙ্গে উড়ে
যায় দুঃখ শিহরন মেশা কবিতায় ছোট ছোট মাসিকপত্রের কোণে
শুয়ে থাকে
এবং গোপন থেকে বেড়ে ওঠে তুলোর কৌটায় রাখা বীজ

যার থেকে জন্ম নেবে বৃক্ষ
যার কোনো ফুল কিংবা ফল আছে কিনা
কেউ তা জানে না!
আবার কখনো শুরু হয় অসময়ে অসি খেলা
পর পর লুটেরা, পুলিশ, ঠক-এইসব কঠিন দেয়াল
ক্রমশ এগিয়ে আসে, ক্রমশ এগিয়ে আসে মাথা লক্ষ্য করে
সে একা, বা দুজন বন্ধুকে নিয়ে লড়ে গেছে জীবন সর্বস্ব
আকাশ ফাটানো কণ্ঠে মধ্যরাতে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি!
অপবিত্র অর্ধাংশকে যে নেবে সে নিক
অপর পবিত্র অংশে এ জীবন পৃথিবীতে
দু'পা গেড়ে দাঁড়াবার
স্থান ছাড়বে না!
সীমানা ভাঙার রোখে রাত্রি ছিঁড়ে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি!
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন!

ধলভূমগড়ে আবার

ধলভূমগড়ে আবার ফিরে গেলাম, যেন এক সৃষ্টিছাড়া
লোভে। ওরা আর কেউ নেই। তরুণ শালবৃক্ষটি, যাঁর
মূলে হিসি করেছিলাম, তিনি এখন পরিবার-প্রধান
হয়েছেন। তাঁর চামড়ায় আর তকতকে সবুজ আঁচ দেখা
যায় না। কাঁটা গাছের ঝাড়ে ঐ থোকা শাদা

ফুলগুলোর নাম কী, জানা হলো না এবারও, ফুলমণি নামে
যে মেয়েটি আমার ওষ্ঠ কামড়ে রক্তদর্শন করেছিল, সে
ডুবে মরেছে দূরের সুবর্ণরেখারয়। সেই নদীর শিয়রে এই
শেষ বিকেলে সূর্যের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে এখন। পাঁচটি
বিশাল বর্শা বিধে আছে আকাশের উরুতে, যেন এই
মুহূর্তে এক দুর্ধর্ষ খেলা সাঙ্গ হলো। মহুয়ার দোকানটির
কোমরে ঐ সিমেন্টের বেদি না-থাকা ছিল ভালো।
ঐখানে এক উম্মাদিনী নর্তকী দেখিয়েছিল তার তেজী
স্তনের কাঁপন, তার নিতম্বের গোঠে ঝামড়ে উঠেছিল
অন্ধকার। শালিকের মতন সে চলে যাবার পরও শব্দটা
রেখে গেছে। মাতালের অট্টহাসি থামিয়ে দেয় ট্রেনের হুইস্‌্‌ল।
জঙ্গলের মধ্যে তিনশো পা স্তব্ধভাবে হেঁটে এক
শুকনো খাঁড়ির পাশে আমরা তিন বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসি।
পুরোনো সৈনিকদের ফিরে আসার কথা ছিল, সর্বাঙ্গ
ক্ষতবিক্ষত, তবু আমরা এসেছি। চিনতে পারো?

নীরার কাছে

যেই দরজা খুলে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটি হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায়।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গনদীর পারের দৃশ্য?

যুথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দুপুরবেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা? ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয়?
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে কে এসেছিল?
ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটি অতসী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম।

প্রতিহিংসা

শিমুল, শিমুল, তুই চুপ করে থাক
জানাস্ নে গোপন কথাটি
ও খুঁজে মরুক, ওর ভিটে মাটি চাঁটি
হয় হোক, ওর বুক দুঃখে পুড়ে খাক!

জারুল, জারুল, তুই দেখাস নে পথ
একা একা সে ঘুরে মরুক
ও চেয়েছে রমণীর সম্মুখ দ্বৈরথ
মাংস, ত্বক ছুঁয়ে ছেনে সুখ!
অশোক, অশোক, ওকে কর বর্ণকানা
যূথী, তুই দিস না সৌরভ
সমস্ত অরণ্যে আজ ওর ঠাঁই মানা
ও চেনেনি রূপের গৌরব।

প্রত্যাখ্যান

দেবে না চুম্বন ঐ ঠোঁটে?
লোধ্রেণু ছড়ানো ওখানে
রূপে যেন গন্ধরাজ ফোটে
মধুলোভী সব কিছু জানে।

দেবে না আবার আলিঙ্গন?
স্তনের ওপরে ছোঁয়া জিভ
ডঙ্কা বাজে রক্তে সর্বক্ষণ
প্রাণ যেন দ্বিগুণ সজীব!

এই বাহু জড়ানো কোমরে
তাও তুমি দূরে ঠেলে দেবে?
গুলমোরের গুচ্ছে আজ ভোরে
রোদের আলপনা দেখো ভেবে?
সমূহ প্রকৃতি থেকে ছেঁচে
নিয়ে আসি তোমার উপমা
তাই নিয়ে বহুকাল বেঁচে
হবে না কি পরিপূর্ণতমা?

প্রাণের প্রহরী

কাব্য নাটক

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেব পাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দুজন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। বাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায় : ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?]

প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে

সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবুওকে ক্লান্ত হতে দেখি না কখনো!

ডাক্তার : ব্যাপারটা কী হে! এত চুপচাপ

বসে আছো কেন? দূর থেকে ভাবলাম

কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন বাগানের মধ্যে একটা ঘর।

কী রে সংবরণ, কী যেন ভাবছিস মনে মনে?

প্রতীক : চুপচাপ থাকবো না কি, নাচানাচি

করবো দু'জনে?

সংবরণ : আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর

কেটে পড়তাম।

ডাক্তার : আরে বোস্ বোস, এত রাগারাগি কেন,

আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম। এসময়

কোনো সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব
মন চায়। সারাদিন রুগী আর রুগী!
কটা বাজলো?
প্রতীক : সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম
ডাক্তার : যথেষ্ট হয়েছে। আজ রুগী দেখা এখানে খতম?
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি। আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে...
কে ওখানে?
সংবরণ : কেউ না তো?
ডাক্তার : মনে হলো একটা ছায়া
সংবরণ : কিছু নেই।
ডাক্তার : ও, এক পার্শী মহিলাকে দেখে আসছি এই মাত্র,
মাগীর অসুখ নেই কোনো
সংবরণ : ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ!
ডাক্তারা : যত বলি, মা-জননী, তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না!
তবু ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে বলে, ঠিকমতো ওষুধ দিচ্ছে না!
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
বড়লোক, টাকার বাণ্ডিল, ঘুম হয় টাকার গরমে?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হলো, স্বাভাবিক। তবু
প্রতিদিনই
ডাক পড়ে।
প্রতীক : আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হলো, আমরা এখনো
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনবো? এর মানে হয় কোনো?

ডাক্তার : না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি। কে ওখানে?
সংবরণ : কেউ না তো?
ডাক্তার : মনে হলো, ঠিক যেন কোনো
মেয়ে, বার-বার ভুল হচ্ছে কেন এরকম?
প্রতীক : টাকার ধান্দায় এত পরিশ্রম!
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে তুমি, ঋষি!
ডাক্তার : (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হতো
'জনান্তিকে'। অর্থাৎ তাঁর এ-কথাটা অন্য কেউ শুনতে
পাবে না)
না, সে রকম নয়। ঠিক বাবলুর অসুখের পর
একটি নারীর ছায়া দেখতে পাই ক'দিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ওকে?
প্রতীক : মেয়েটি কেমন দেখতে?
ডাক্তার : (চমকে) কোন্ মেয়েটি?
প্রতীক : ঐ যে পার্শী মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে।
ডাক্তার : অসুন্দর পার্শী আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনো,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনো
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও। এই যে মহিলাটি,
রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি!
সংবরণ : তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু আমাদের যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,

‘ওটা মানসিক রোগ!’
ডাক্তার : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি।
অন্যান্য সময়ে দূর শালা! মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে। ইচ্ছে আছে মনটাকে ল্যাবরেটরিতে
একদিন ঠেসে ধরবো। পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু আর ব্যোম। অত্যন্ত সস্নেহে
শরীর এদের পোষে। এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারিটিকে ঢের নেড়েচেড়ে দেখা গেছে, কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অথাৎ শূন্যতা
তার কোনো দিশা নেই, কোনো শাস্ত্রে নেই তার কথা।
সংবরণ : এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে, তা পড়োনি বুঝি?
তা পড়বে কেন? ডাক্তারেরা বই-টই পড়ে না। শুধু মাত্র রুজি
রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত
ডাক্তার : বাজে কথা বলো না হে! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,
হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় গ্রন্থ আছে?
প্রতীক : এ সমস্ত শস্তা দার্শনিকতা দিয়ে পেট ভরবে ভাই?
ঢের হলো! মাল কড়ি ছাড় কিছু মাল টাল খাই?
ডাক্তার :হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।
কে, কে ওখানে?
প্রতীক : জ্বালানৈ দেখছি আজ। থেকে থেকে বারবার কে, কে?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তা খানিকটা শেখে?

রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি?
ডাক্তার : না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে
[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকলো, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু! নদীতে মাঝিরা যে রকম সুর করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]
সংবরণ : ঐ তো এসেছে কেউ
প্রতীক : ফের কোনো রুগী-টুগী
সংবরণ : এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে
ডাক্তার : না, না, এ সে নয়। একে জানি। চিনি এর গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাতদিনের পাকা দাড়ি। একটা রঙ জ্বলে যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।
আগন্তু : ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার : কে, ধরণী?
আবার এসেছে, তুমি এখনো মরোনি
আগন্তু : (সাগ্রহে) মরবো, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার : মরার কি অন্য কোনো জায়গা পেলে না?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা?
আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার : সাতদিন কোথা ছিলে? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে?
আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার : চুপ করো! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ।
[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিট চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনো কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে

গেল।]।
প্রতীক : কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা?
সংবরণ : আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও, ব্ল্যাকমেল নাকি?
ডাক্তার : ব্ল্যাকমেলই বটে! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক
হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া বড় দোষ।
বেকারের ছেলেদের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ!
প্রতীক : আবার দুঃখের গপ্পো! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।
ডাক্তার : না, না, না, না; এবারই তো শুরু হবে খেলা।
সংবরণ : ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন?
তুমি কি সমাজ? নাকি রাষ্ট্র? নাকি দাতাকর্ণ?
ডাক্তার : সে সব কিছু না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন চর্যায়
এরকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ করা মুখ
মেলে আছে, ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ!
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায়! দু তিনবার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এসবের।

এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ বেরিয়েছে? তবে?
নাকি বিষ দেবো?
আমি তো ডাক্তার, কিছু দিতে হবে–
প্রতীক : ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো
মালের উৎসবে।
ঝুঁদ হয়ে থাকি। তুমি অতি বুদ্ধ তাই এখনো উত্তর
চাও, এখনো বিবেক নিয়ে প্যানপান, ধুত্তোর
ডাক্তার : কানাই, নিয়ায়, আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই।
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে
সংবরণ : এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না
ডাক্তার : সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল, কেনা
বিশেষ দরকার।
প্রতীক : 'মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার'
ডাক্তার : (চমকে) তার মানে?
প্রতীক : ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার' ,
ডাক্তার : কার পুত্র? কে জল্লাদ?
প্রতীক : প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে!
ডাক্তার : এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্র হন্তা, সেই বুঝি ভালো...
মাত্র ন' বছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়ালো।
এ কি প্রতিশোধ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে

মৃত্যুকে ফেরাই।
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা?
সংবরণ : কী রকম আছে বাবলু?
ডাক্তার : যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,
অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে
সংবরণ :কী ঠিক অসুখ ওর?
ডাক্তার : নেফ্রটিক সিনড্রম। ঠিক বুঝবে না তোমরা,
দুটি কিডনিতেই অজানা অসুখ।
সংবরণ : অজানা অসুখ?
ডাক্তার : আশ্চর্য হলে কি? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনো অচেনা কিছু রয়ে গেছে।
প্রতীক : বিশ্বাস করি না। তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্র নাও
সংবরণ : কিডনির অসুখ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব
প্রতীক : আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...
ডাক্তার : ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই

সংবরণ : ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো
ডাক্তার : হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে
পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশজন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ-ফল হলো ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,

পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি!
সংবরণ : পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি?
এ যে সাঙ্ঘাতিক
এ কি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক
ডাক্তার : যাক আর ঐ কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই
ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে গ্লাসে ঢালা
কে ওখানে?
কে ওখানে?

দ্বিতীয় দৃশ্য
(হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু। ন দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচজন ডাক্তার। কলের মুখ মেঘলা, ঋষি তাঁর অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন :]।
ঋষি : স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে
সব ঝুঁকি নিয়ে ভেবেচিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে,
আপনি দিন
স্যার : ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বলল না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে

ঋষি : স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা
সারাদেশে আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই
স্যার : তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে।
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, জেনেশুনে তা আমি কী করে
দিই?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের।
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাবো, বলো?
ঋষি : (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি
লাহিড় : না, না, ঋষি ক্ষমা করো।
ঋষি : ডাক্তার সামন্ত? আপনিও ভয় পেয়ে সা
মন্ত : ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া।
ঋষি : অর্ধেক জীবন? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না?
ঠিক আছে। তা হলে আমিই নিজে পুত্রাঘাতী হবো,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাবো।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]
ঋষি : বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়, আমরা।
দুজনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াবো
বাবলু : বাবা–
ঋষি : বাবলু, বাবলু
বাবলু : বাবা, তুমি কত দূরে?
ঋষি : এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে
বাবলু : ভীষণ যন্ত্রণা! বাবা তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,

আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই–
ঋষি : এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাবো সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে
বাবলু : খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা?
ঋষি : চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না
দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে?
বাবলু : ছুরি নেই? এ যে ইঞ্জেকশান!
ঋষি : বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে, সেখানে আমাকে দোষ দিস, ভেবে
নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়
পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনোক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়।
বাবলু : বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো, তাই দেবো, তোর মা আমাকে মাথার
দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয়-বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়

তুই রাজি? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী
বাবলু : আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ
ঋষি : তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক
(মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো চুল। তার চোখে জল]
মৃত্যু : একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে
ঋষি : কে তুমি?
মৃত্যু : চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে? বহুবার
দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে
ঋষি : তুমি নেই? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিত মিলিয়ে যাও
মৃত্যু : বারবার ফিরে আসি
ঋষি : আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে? এমন প্রণয়?
আপাতত বাইরে যাও
মৃত্যু : আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাবো
ঋষি : তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও।
মৃত্যু : আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু
অসীমে পাঠাবো, দাও...
ঋষি : ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা

তাও কি অসীম নয়? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও?
মৃত্যু : ঋষি, তুমি দেখেছছ অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা? সব মিথ্যে আমি শুধু ধ্রুব
ঋষি : তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু চোখে
কেন জল? তোমার কি চক্ষু রোগ?
মৃত্যু : আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি
বাবলু : বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো?
ঋষি : কেউ না, বাবলু সোনা! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।
বাবলু : বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি : এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত
মৃত্যু : ঋষি, থামো
ঋষি : আঃ, বিরক্ত করো না, যাও
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে যাবে
ঋষি : যাই যাবো। তবু আমি কোনোদিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী!
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও।
মৃত্যু : শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনো দু মাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনো রয়েছে ওর শ্বাস,

কেন তা থামাবে তুমি? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক
আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখবো জননী অধিক।
ঋষি : কে চায় তোমার কৃপা? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে কোন্
অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
–তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী!
মৃত্যু : ঋষি, শান্ত হও
বাবলু : বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত
মৃত্যু : ঋষি, শোনো
ঋষি : চুপ!
[ঋষি ইঞ্জেকশানের সূচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে।
বাবলু দুবার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায়
সেতারের তার ছেড়ার মতন শেষ শব্দ হলো। ঋষি সে দিকে
একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।]
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে গেলে
ঋষি : (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে
মৃত্যু : আগেই বলেছি হেরে যাবে

ঋষি : খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিৎ আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনো হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু
মৃত্যু : সুখী নই, সুখী নই
যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখ-শূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দুজনেই একসঙ্গে কাঁদি।

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দুজনে বাবলুর দুপাশে হাঁটু গেড়ে বসে।
জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কেউই চোখের জল
ফে লে কাঁদে না। তারপর মৃত্যু হাত বাড়িয়ে বাবলুকে ছুঁতেই ঋষি
মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন যবনিকা নামে।

[এই কাব্য নাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হবে। এবং দক্ষিণা স্বরূপ লেখককে দিতে হবে অন্তত একটি নীল রঙের জামা কলারের সাইজ, আটত্রিশ।]

ফুল

গাছ তার ঝরে পড়া ফুলগুলি নিয়ে কিছু ভাবে?
ঘাসের ওপরে ফুল, তখনো শিশির ভেজা

ছুঁয়ে যায় বালিকার হাত
ভোরের বাতাস কিছু স্নেহ করে
তপন তখন সংবরণ করে তেজ
ফুলগুলি চলে যাবে, গাছ কিছু ভাবে?

ফুলের ভিতরে নেই বিষ, তাই
সুন্দরের প্রসিদ্ধি পেয়েছে
শিমুল, জারুল, শাল এ রকম লম্বা চওড়া গাছও
এমন কোমল ফুলে ছেয়ে থাকে কেন?
এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন?
এ কি শুধু ঝরাবার খেলা?

তারপরই ঘোর ভাঙে
সুন্দরের পাশে এসে প্রহরীর মতো
দাঁড়ায় নিখিল প্রয়োজন
সব কিছু ঠিকঠাক চলে
আমিই বা কেন এত ফুল নিয়ে মাথা মুণ্ডু ভাবি!

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা?
স্বপ্নের ভেতরে জাগে শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি
প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি?

আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না ফেরার পথে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো।

দেখোনি স্থাণুর কীট? দেখোনি সমস্ত দিন
ভূলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিচ্ছার ধুলো?
এ রকম কথা ছিল? যখন তখন সব
প্রয়াসে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না? যেতেই হবে, এখন না যদি যাই, তবে আর কবে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো!

বকুল গাছের নীচে

বকুলগাছের নীচে অকস্মাৎ নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা, ছন্নছাড়া!
দিগন্তকে একদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়েছে যারা
তারা নেই, সবাই প্রবাসী
আজ শুধু শোনা যায় দূর প্রান্তে শীতের সঙ্কেত
ভুল হয় যেন কার বাঁশী
রাতের বকুল ঝরে, জ্যোৎস্না ভ্রমে ডেকে ওঠে কাক
ওখানে কি ছায়া, না ইশারা?

যারা ভালোবেসেছিল আজ সকলেরই বুক পুড়ে খাক
তবু শোনা যায় কার হাসি?
বকুল গাছের নীচে একদিন নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা ছন্নছাড়া–

বাসের ভিতরে

বাসের পাদানি তটে দুটি ইঞ্চি পেয়ে যাই বহু পুণ্যফলে
বিকেল পাঁচটায়
তারপর বিহঙ্গেরা যেমন স্বাধীন, সেরকমই ভিড়ের ভিতরে
যখন যেখানে খুশি যাও,
মানুষ তরল জল, শুধু স্রোতে ভাসা
মহিলা জোয়ার ছেড়ে আরও দূরে দৈনন্দিন সুখ
ডিজেলের কটু গন্ধ, সব ঠিকঠাক।

বুকের বোম একটু টুপ করে খসে পড়ে সহসা এবং অকারণ
মনে মনে সর্বনাশ গণি
বোতামের এই খুনসুটি, এই নিরুদ্দেশ অতিশয় ছিরিছাঁদহীন
আমার এমনই ভাগ্য, ঠিক ওরকম আর কখনো পাবো না
খুঁতো হয়ে যাবে সব, এরকমই হয়।
ঠিক যেন জলে ডুব দেওয়া–
আমি তৎক্ষণাৎ বসি পড়ি, ব্যস্ত হাতে ধুলো ঘাঁটি
এক সঙ্গে এত পদতল, তার কাছে আমার ব্যাকুল মুখ
অনেকে চমকায় কেউ রেগে ঘোড়া হয়ে লাথি ছোঁড়ে
কেউ বা ভিখারি ভেবে তু-তু করে, কেউ জুতোপালিশ চায় না

কোথায় বোতাম?
কোথায় সে জলস্রোত, কোথায় সে নারী পুরুষের বুকেবুক মাখামাখি
ঝসের ভেতরে এক বাঁশবন, তার মধ্যে এক ডোম কানা।

ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত?
ভালোবাসা শুধু শ্রাবণের হা-হুতাশ?
ভালোবাসা বুঝি হৃদয় সমীপে আঁচ?
ভালোবাসা মানে রক্ত চেটেছে বাঘ!

ভালোবাসা ছিল ঝর্নার পাশে একা
সেতু নেই তবু অক্লেশে পারাপার
ভালেসবাসা ছিল, সোনালি ফসলে হাওয়া
ভালোবাসা ছিল ট্রেন লাইনের রোদ।

শরীর ফুরোয় ঘামে ভেসে যায় বুক
অপর বাহুতে মাথা রেখে আসে ঘুম
ঘুমের ভিতরে বারবার বলি আমি
ভালোবাসাকেই ভালোবাসা দিয়ে যাবো।

মানুষ যতটা বড়

মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড়

পাহাড়ের কাছে গিয়ে মানুষ প্রথমে নত
করেছিল মাথা
তারপর পাহাড় শিখরে উঠে
কালপুরুষের দিকে দিল হাতছানি!
মানুষ লিখেছে এই সমুদ্রের
সহস্র বন্দনা
অসীম পদবী দিয়ে দেখিয়েছে
মহৎ সম্মান
তারপর তুড়ি মেরে সমুদ্রকে করে গেছে
এ ফোঁড় ও ফোঁড়
নিজেই অসীম হয়ে জলধিকে স্তম্ভিত করেছে!
মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড়।

মানুষের মুখ চিনে

শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল
ওদের নিজস্ব রাস্তা, ওরাই দৌড়োবে
ওদেরই মুখোশ নিয়ে দেশে দেশে চলে যায় অবিমিশ্র দূত
বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে কোনোদিন
একজনও পড়ে না।
বাঁধানো দাঁতের হাস্যে সভ্যতার নাম রটে খুব।

শুয়োরের বাচ্চাদের কৌতুক কাহিনী নিয়ে
ভরে যায় মহাফেজখানা

ওরাই নদীতে বাঁধে সেতু, ফের দু একবার
বিছানায় পাশ ফিরে ওদেরই নিজস্ব অস্ত্রে
টুকরো হয়ে ছিটকে যায় কংক্রীট মিনার!
অন্যদিকে রক্তের নদীতে ভাসে সুদৃশ্য তরণী
সেখানে সঙ্গীত-সুরা, কঙ্কালের সঙ্গে পাশা
খেলে পুরোহিত
শুয়োরর বাচ্চাদের এই সভ্যতার গায় হিসি করে দাও!

তুমি আমি ফিরে যাব, আমরা অসভ্য রয়ে যাবো।
এখনো অরণ্য আছে, হিম আকাশের নীচে এখনো কোথাও
পরাগ-সৌরভ ভাসে, শিস দেয় রাতচরা পাখি
লুকোনো ঝর্নার পাশে আমরা উলঙ্গ হবো, মায়াবী জ্যোৎস্নায়
মানুষের মুখ চিনে মানবিক নাচের উৎসব শুরু হবে।

মায়া সুন্দর

ফণা তোলা সাপের মতন এমন বিচিত্র সুন্দর আর কি আছে
অথচ তা পাখির মতন সুন্দর না!
তারপর সাপ চুপি চুপি ছোবল মারে পাখির বাসায়
রাত্রিতে গড়িয়ে পড়ে কান্না
সুন্দরের মধ্যে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা হা-হা করে
অসহায় পাখি-মা একটু দূরে ডানা ঝাপটায়
তার ঠোঁটে-ধরা তখনও একটি প্রজাপতি
পুরো দৃশ্যটি ঝলসে ওঠে যুবতী জ্যোৎস্নায়
অপরূপ দেবদারু গাছটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে

কেন না তার নীচে অপেক্ষমাণ এক নারী
যে মায়া দর্পণকে প্রশ্ন করেছিলো,
বলো তো, আমার চেয়ে অসুখী আর কে আছে
সে জানে তার জন্য আজ কেউ আসবে না
এই অপরূপ মায়ার সন্নিধানে
বিচ্ছেদ আরও মধুর যে!

মুখ দেখিনি

চিড়িয়া মোড়ে নেমে পড়লো দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি
মাথায় ছিল রোদের উল এলোকেশিনী
বাহুর কাছে স্বর্গ সুবাস দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি
আমার যেটুকু প্রাপ্য আমি তার বেশী নি’
ভুরুর একটু বাঁক দিলো না এলোকেশিনী
ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি।

রূপনারানের কূলে

রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
পৃথিবীতে নতুন চাঁদ উঠেছিল সেদিন,
অজানা ধাতুর মতন আভা
তার নিচে মধুলোভীদের দুরন্ত হুটোপুটি

নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য সিল্কের ওড়না
পাগল গলার গান দিগন্তের কাছে নিয়ে আসে
নারীদের কারুর পা এই ধুলোমাটির পৃথিবী ছোঁয় না।
যেন আমরা এসেছি দৈব পিকনিকে
নতুন চাঁদের নিচে সেই এক নতুন রাত্রি
সেই পূর্ণকে শূন্য করায় প্রতিযোগিতা, গোপন চুম্বন
আঙুলে-আঙুল ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় বিদ্যুৎ
গোল স্তনগুলিতে আগুনের হলকা
কৌতুক-হাস্যে ভাঙে বিশেষ তরঙ্গ, যা আগে কেউ জানেনি!
বাতাসের সুগন্ধ আমাকে অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায়
সকলের থেকে খানিকটা দূরে
নদীর কিনারে বসে, আকস্মাৎ একা হয়ে, মনে পড়ে
এই খেলা ভেঙে যাবে!
অথচ জীবন এরকম সুস্বপ্ন হবার কথা ছিল
অথচ জীবন কেন এই স্বপ্ন থেকে নির্বাসিত?
তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি এক হাত জলে ডুবিয়ে
নদীকে সাক্ষী রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।
আমাকে জাগিও।।

রেলের কামরায় পিপড়ে

এ পৃথিবী চেয়েছে চোখের জল, পায়নিও কম
যেটুকু দেবার দিয়ে যে-যার নিজের পথে চলে যায়
মাঝে মাঝে এমন উদাস করা আলো আসে
অনেকে দেখে না, কেউ দেখে

তখন সে কার ভাই, বন্ধু? কার আর্যপুত্র? সে কারুর নয়
বড় মায়া, বুক হেঁড়া দীর্ঘশ্বাস, আবাল্যের এত স্নেহ ঋণ
বিষণ্ণতা পায়ে হেঁটে চলে যায় সূর্যাস্তের দিগন্ত কিনারে
রেলের কামরায় পিপড়ে যে-রকম যায় দেশান্তরে।

লাইব্রেরীর মধ্যে

লাইব্রেরীর মধ্যে এক মৃত্যু
অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে শুয়ে আছে
এত মৃত মনীষার মাঝখানে ঐ এক ছড়ানো শরীর
এখনো উত্তপ্ত, ঠোঁটে কফির বাদামী স্বাদ
আঙুলে দীর্ঘায়ু আংটি
নোখে কিছু ধুলো
ঐ হাত ছুঁয়েছিল বহু শতাব্দীর ইতিহাস
এখন নশ্বর হয়ে পড়ে আছে, এখন কিছু না!

সব শেষ হয়ে গেলে নিস্তব্ধতা জানালায় বসে...
রোদ্দুর গুটিয়ে যায়, ডানা মেলে আসে দীর্ঘ যাম
পঞ্চম ভম থেকে সে সময়
দেকার্তকে ডেকে বলে তৃতীয় চার্বাক
ছিঁড়ে ফেলো সব তত্ত্ব,
এই ছোকরা দেখিয়ে দিলো হে
ইচ্ছামৃত্যু কতখানি
মাথা উঁচু করে চলে যায়!
দক্ষিণের শেলফে বসে নীৎসের সমর্থন, ঠিক, ঠিক, ঠিক।

শব্দ আমার

শব্দকে তার বাগানটি দাও, শব্দ একলা বন্দী ঘরে
যেমন ছিল বাগান সেই নদীর ধারে পোড়ো বাড়ির
যেমন ছিল পায়ের তলায় সর্ষে, শিশুর খেলনা গাড়ি!
এই বিকেলের সিংহ-মার্কা খাঁটি আলোয় ইচ্ছা করে
ভালোবাসার গায়ে লাগুক খ্যাপার মতন ঝোড়ো বাতাস-
টুকরো-টাক্‌রা কগজপত্র, মলিন ঘর, ছেঁড়া আঁধার
অনিশ্চিত চিঠির বাক্সে সাত মাইলের গন্ডি বাঁধা
এসব থেকে বেরিয়ে আসুক একটা হল্‌কা। সারা আকাশ
দু'ভাগে চিরে একটি অংশ চোরাবাজোরে যে-খুশি-নিক-
আরেক দিকে বাগান, সব ছেলেবেলার স্বপ্নে ফেরা
শিমূল তুলোর ওড়াওড়ি, দিক-ভোলানো দিঙনাগেরা
শব্দ আমার জীবন, আমার এক জীবনের পরম ক্ষণিক!

শিল্প প্রদর্শনীতে

একটি বিমূর্ত মূর্তি, পাথরের, সুবৃহৎ চৌকো চোখ
গালে যেন পচা মাংস, অদ্ভুত বীভৎস ওষ্ঠাধর
শিল্পী এরকম গড়েছেন
আর ঠিক তারর সামনে শাড়ী-মোড়া জীবন্ত সুন্দর।

টেবিলের পাশ থেকে শিল্পীটি এগিয়ে এসে
স্মিত হাসলেন
তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে পরিচয় সাঙ্গ হলো চোখে চোখ রেখে

রমণীর বাঁ স্তনের ওপরে ব্যাগের স্ট্র্যাপ,
কটিতটে নদীর জোয়ার
আঁচলে সুগন্ধ, চিবুকের মসৃণতা রেশমের ঈর্ষা আনে
এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়।

দু'একটি কথার পর পুনরায় দ্রষ্টব্যের দিকে মনোযোগ।
'দারুণ' এ হেন শব্দে প্রশংসা ছটফট করে
'সভ্যতার খাঁটি রূপ শিল্পীর বলিষ্ঠ হাতে
যেরকম জীবন্ত হয়েছে...'
'বিশেষত চোখে ঐ যে অসহায় আর্তনাদ'
বিনয়ে শিল্পীর ঘাড় নিচু, মুখখানি দুঃখী দুঃখী
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে এ সময়?
নারীর ভুরুতে দুটি মুক্তবিন্দুসম ঘাম
এইমাত্র মুছেছে রুমাল
যেন দেবদূতী তার বিস্ময়ের উপহার দিয়েছে দ্রষ্টাকে
'চলুন চা খাওয়া যাক', এই বলে এর পরে
সকলেই টিনের দিকে...

সুধা, মনে আছে?

তিনজন অমলকে চিনি তারা কেউ ডাকঘরের নয়
দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যজন এখন বিদেশে
প্রবাসী অমল বেশ স্বাস্থ্যবান, যেমন দরাজ বক্ষ,
তেমনি বিশাল সুখী, মদ্যপানে খুব নামডাক
আরেকজন টালিগঞ্জ থেকে রোজ শিয়ালদায় এসে

ঘড়ির দোকানে বসে
ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঘোরে।
অপরটি জাঁহাবাজ শব্দ সওদাগর
আমাকেও মাঝে মাঝে বুঝিয়েছে জীবনের মানে
তার স্ত্রীকে দুপুরে একলা দেখি পার্ক স্ট্রীটে
সে কথা বলি না।
তিনজন অমলকে চিনি, তারা কেউ ডাকঘরের নয়।

রূপালি পর্দার মতো বৃষ্টি ওড়ে, ভোরবেলা ভেঙে যায় ঘুম
বাড়ির সামনে রাস্তা, এত চেনা, তবু যেন মনে হয়
চলে গেছে অনন্ত সন্ধানে
গাছগুলি বাউলের মতো হাত বাড়িয়েছে
আকাশের দিকে
ফিরিওয়ালা আজ এক অন্য সুরে গান গেয়ে গেল
আমার চমক লাগে
একলক্ষ রোমে শিহরন
জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই টের পাই,
আমি বন্দী
যা কিছু কাজের ছিল, সকলই অচেনা
তখন হঠাৎ সেই তিনজন অমল এসে
একসঙ্গে, কাতর গলায় প্রশ্ন করে,
সুধাও কি ভুলেছে আমাকে?